পরলোকগত অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন বন্দো-পাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী কথা।

(শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত) ।

অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন ঢাকার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত পূরাপাড়া গ্রামে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জনের বয়স যখন পাঁচবৎসর মাত্র তখন তাঁহার পিতাঠাকুর তাঁহাদের একেবারে অকূলে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। সংসারে শিশু দক্ষিণারঞ্জন, দুইটী ভগিনী ও বিধবামাতার ভরণপোষণ করিবার মত লোক কেহই ছিল না। বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় নামক তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা তাঁহাদের প্রতিপালনের ভার না লইলে তাঁহার সদ্যবিধবা মাতৃদেবী এই অপোগণ্ড শিশুদিগকে লইয়া নিতান্তই বিব্রত ও অসহায় হইয়া পড়িতেন ।

বালক দক্ষিণারঞ্জন মনযোগসহকারে স্থানীয় মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি ঢাকারই অন্তর্গত পগজ উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তথা হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ঘোর দারিদ্র্য এবং নানা পারিবারিক অসুবিধা সত্ত্বেও জ্ঞানলিপ্সু দক্ষিণারঞ্জন এফ্-এ,

পড়িবার মানসে রাজসাহী কলেজে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এফ্-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কলেজেই বি-এ, পড়া আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভগবান্ বুঝি অধ্যয়নোৎসাহী এই বালকের প্রতি বিরূপ হইলেন। নানা অসুবিধা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িয়া তিনি বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া ঢাকার সোনারং ন্যাশানল্ স্কুলে অঙ্ক শিক্ষকেরকর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

এই জাতীয় বিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠানে অল্পবিস্তর লিপ্ত থাকায় এইসময়ে তিনি পুলিশের "নেক্‌নজরে" পড়িলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর মাত্র। অতঃপর ২৬ বৎসর হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ৬ বৎসর কাল তাঁহাকে পুলিশের নজরবন্দী হইয়া কাটাইতে হইয়াছিল। বাধ্য হইয়া তিনি ন্যাশানল স্কুল ত্যাগ করিয়া মাদারীপুর উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে আবার অঙ্কশিক্ষক হইরা প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাজরোষ এখানেও তাঁহাকে অব্যাহতি দিল না। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট বিজ্ঞপ্তি দিলেন যে এরূপ "দাগী" লোক স্কুলের শিক্ষক রাখা চলিবে না। স্কুলের সেক্রেটারী বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন।

এরূপ দারুণ দারিদ্রেও তিনি বি-এ, পাশ করিবার আশা ছাড়েন নাই। স্কুলের শিক্ষকতা করিতে করিতেই তিনি "প্রাইভেট্" ছাত্ররূপে বি-এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন এবং পরীক্ষাও দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অকৃতকার্য্য হইলেন। এই অকৃতকার্য্যতার জন্য তাঁহার অবস্থাই দায়ী ছিল। ইহার পর আর শিক্ষকতাপদ না মেলায় দ্বিতীয়বার প্রাইভেটে বি-এ, পরীক্ষা দিবার আশা জলে ভাসিয়া গেল।

ইহার পরেই তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যক্ত করিলেন। অধ্যক্ষ বসু মহাশয় স্বীয় কলেজে তাঁহাকে যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়া ভর্ত্তি করাইয়া লইলেন। উক্ত কলেজে তিনি বি-এস্-সি, অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বসু মহাশয়ের চেষ্টাতেই অনেক কালি-কাগজ খরচ করিবার পর "দাগী" দক্ষিণারঞ্জন ও তাঁহার অন্যান্য দুইচার জন বন্ধু ও সহকর্ম্মী রাজরোষ হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

Distinction এর সহিত বি-এস-সি, পাস করিয়া তিনি Botanyতে এম-এস্-সি, পড়িতে লাগিলেন। অধ্যক্ষ বসু মহাশয়ের সাহায্য তাঁহার পথকে সুগম করিয়া তুলিল। যথাসময়ে পরীক্ষা-প্রদানানন্তর তিনি পুনরায় বিষ্ণুপুর (বিহার) গমন করতঃ তত্রস্থ স্কুলে অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইল। বিদ্যার্থীর সাধনা সফল হইল। সসম্মানে তিনি এম-এস্-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার পর কিছুদিন তিনি Royal Botanic Gardenএ কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কলেজে Botanyর অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদেই নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৭ খৃঃ Bangabasi College Hostel (অধূনা Canning Hostel) স্থাপিত হইলে তিনি Resident Superintendent এর পদে নিযুক্ত হইলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদই অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

Botanyর অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ছাত্রগণের অসুবিধা দূরীকরণার্থ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Botany পরীক্ষার্থিগণের উপযোগী করিয়া এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার এই পুস্তক

ছাত্রগণকর্ত্তৃক খুবই সমাদৃত হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। তিনি নিয়মিতরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Botanyর পরীক্ষক ছিলেন। Botany শাস্ত্রে D. Sc. উপাধি লাভের জন্য তিনি Research বহুদিন হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু নিষ্ঠুর কাল জীবন মধ্যাহ্নেই তাঁহার আয়ুসূর্য্যকে অস্তমিত করিল।

Canning Hostelএর Superintendent পদে তিনি Hostelএর প্রতিষ্ঠা হইতেই নিযুক্ত ছিলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি এত দক্ষতার সহিত নিজ কার্য্যভার পরিচালনা করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক ছাত্রই তাঁহার উদার অমায়িক ভাবে মোহিত না হইয়া পারিত না। শেষ পর্য্যন্ত কোন ছাত্রকে তিনি শাস্তি দেন নাই অধিকন্তু ছাত্রগণ তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল। ছাত্রগণের বাৎসরিক উৎসব, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি প্রত্যেক ছোটবড় অনুষ্ঠানেই তিনি ছাত্রগণের সহিত কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া প্রত্যেক অনুষ্ঠানকেই সাফল্যমণ্ডিত করিতেন।

নিজে দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া গরীব ছাত্রগণ চিরকালই তাঁহার দয়া ও সহানুভূতির পাত্র ছিল। বর্ত্তমানে গরীব ছাত্রকে যে তিনি ছাত্রাবাসে থাকিবার ও খাইবার সুবিধা করিয়া দিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার অসীম দয়ার গুণেই ইহা সম্ভব হইত। তাঁহার উপরটা ছিল ফল্গুনদীর মত নীরস আর ভিতরে ছিল করুণার প্রস্রবণ, তাই যে ছাত্র তাঁহার কঠিন বহিরাবণ ভেদ করিয়া অন্তরের উৎস-মুখে পৌঁছিতে পারিত তাহার আর ভাবনা ছিল না। তাঁহার এই কারুণ্য বহুছাত্রের নিকট তাঁহাকে শ্রদ্ধাভাজন করিয়া রাখিয়াছে।

বিগত গ্রীষ্মবকাশের মাঝামাঝি তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু এই জ্বরই যে তাঁহার কালরোগ হইবে তাহা কে জানিত।

দুই চার দিনের মধ্যেই Typhoidএর লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং জ্বরের ত্রয়োদশ দিবসে ৩রা জুন বেলা ২৷৷০ টার সময় তাঁহার জীবন প্রদীপ অকালে নিভিল। "Whom the Gods love, die young"— তাই বুঝি এত শীঘ্র ভগবান তাঁহার মঙ্গলকর প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইলেন।

নিমতলা ঘাটে তাঁহার নশ্বর দেহের শেষকার্য্য সমাধা হইল। সাতটী পুত্র এবং তিনটী কন্যা রাখিয়া তিনি সকলকে কাঁদাইয়া অকালে—মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন।

তাঁহার এই অনাড়ম্বর জীবনে বড় ঘটনা কিছু নাই কিন্তু তাঁহার ছাত্রজীবন ছাত্রগণের পক্ষে এবং পারিবারিক জীবন অন্যান্যের পক্ষে আদর্শস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বীয় জন্মভূমি পূড়াপাড়ার প্রতি তিনি কোন দিনই বীতশ্রদ্ধ হন নাই। তাঁহার গ্রামে তাঁহারই চেষ্টায় Post office সংস্থাপিত হয়, স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ছাত্রগণের জন্য এক পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অধিকন্তু তাঁহার জন্মভূমির রাস্তাঘাট প্রভৃতি আজ যে এত উন্নত হইয়াছে তাহা তাঁহারই চেষ্টার ফল স্বরূপে।

ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে চিরদিন শান্তিতে রাখুন!